প্রসঙ্গ ঔপনিবেশিকতার প্রভাব ও মুক্তির পথ অন্বেষণ ঃ প্রেক্ষিত রবীন্দ্র নাটকের মঞ্চসজ্জা

কৌশিক দাশগুপ্ত
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, চাস মহাবিদ্যালয়, চাস, ঝাড়খন্ড

ঔপনিবেশিকতার ঊর্ণজালে ভারতবর্ষ বেষ্টিত ছিল সুদীর্ঘ দুশো বছর। এই সময় পর্বের একটা বৃহদাংশ জুড়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এমন ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল যে ঐ শাসন ভারতবাসীর পক্ষে ঈশ্বর প্রদত্ত বর বিশেষ। ভারতবাসীর যাবতীয় কল্যাণ তথা উন্নতির প্রধান কারণ ঔপনিবেশিক শাসন। তবে এই ধারণা যে খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এমন বলা যাবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ পর্বে ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিকতার দুর্মদ রূপ ভারতবাসীর সম্মুখে উন্মোচিত হতে থাকে। বুদ্ধিজীবীরাও উপলব্ধি করতে পারেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসন ভারতবাসীর পক্ষে লাভজনক হলেও অনেকক্ষেত্রেই তা ক্ষতিরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তা হল আপন ঐতিহ্য-কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে এক তীব্র অবজ্ঞা বোধ সঞ্চারিত হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। ভারতবাসী বিস্মৃত হয়েছে আপন জাতীয়-সত্তা। এই পর্বে দাঁড়িয়ে শুরু হয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের এক বিপুল আয়োজন। সেই সময় পর্বে আবির্ভূত মনীষীরা সকলেই আপন আপন ক্ষেত্রে প্রয়াস চালিয়ে যান। ব্যতিক্রম নন যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র হল রবীন্দ্র-নাটকের মঞ্চসজ্জা।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে বংশানুক্রমে নাট্য প্রীতি প্রবাহিত হয়েছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজদের চৌরঙ্গী ও সাঁ সুসি থিয়েটারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। দুটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠাকালেই তিনি প্রভূত অর্থ সাহায্য তো করেছিলেনই, তাছাড়া তৎকালীন ড্রামাটিক ক্লাবের সদস্যও তিনি ছিলেন। তাঁর অভিনয়ের প্রতি এই অনুরাগ উত্তরাধিকার সূত্রে পৌঁচেছিল তাঁর পুত্র তথা পৌত্রদের মধ্যে। দ্বারকানাথ পুত্র গিরীন্দ্রনাথ 'বাবুবিলাস' নামক একটি নাটক রচনা করেছিলেন। তার অভিনয়ের আয়োজনও হয়েছিল অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে। গোপাল উড়ের যাত্রার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। এই নাট্যশালায় মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। ঐ নাট্যশালায় অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' সেই যুগে কলকাতার নাট্যমোদীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন তোলে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে তাঁর পুত্রদের এইসব প্রয়াসে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। সখের থিয়েটারের যুগে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা স্থাপিত হলেও শুধুমাত্র আমোদ প্রমোদ বা পারিবারিক আভিজাত্য প্রদর্শনের সংকীর্ণ পরিসরে এই নাট্যশালা নিজের উদ্দেশ্যকে সীমাবদ্ধ রাখে নি। নাট্য উপস্থাপনা নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন পথ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁরা। পরবর্তী কালে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চার হাতেখড়ি। প্রথমদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে পারিবারিক অভিনয়ের আসরে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের সূচনা; তারপর নিজস্ব নাটক রচনা, অভিনয়, পরিচালনা। কিন্তু বরাবরই মঞ্চের প্রয়োগ কুশলতার প্রতি এক আন্ত্যন্তিক কৌতূহল ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। যে অনুসন্ধিৎসা একদিন তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকেই তিনি সফলভাবে বহন করে গেছেন সমগ্র জীবনব্যাপী। শুধু বহন করা নয়, তার মধ্য দিয়ে তিনি নাট্যমোদী ব্যক্তিদের সামনে উপস্থাপন করে গেছেন মঞ্চসজ্জা সম্পর্কিত এক নতুন দর্শন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বেশ কয়েকটি গীতিনাট্য রচনা করেন, সেগুলি অভিনীতও হয়। এই গীতিনাট্য গুলির মধ্যে কিন্তু রবীন্দ্র মঞ্চভাবনার স্বকীয়তা তেমন ভাবে আবিষ্কৃত হয় নি। প্রথম যে নাট্যাভিনয় নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠা এনে দিল, সর্বোপরি মঞ্চভাবনার স্বকীয়তা দেখা দিল তা হল 'বাল্মীকি প্রতিভা'। ঠাকুরবাড়ির 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সভা উপলক্ষে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'বাল্মীকি প্রতিভা।' ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১, এই 'সুরেনাটিকা' প্রথম অভিনীত হয় মহর্ষিভবনের বহির্বাটির তেতলার ছাদে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ঐ অভিনয় উপলক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এই সময় ঠাকুরবাড়িতে যে-সব অভিনয় সংঘটিত হচ্ছিল সবগুলিতেই বাস্তবানুগ মঞ্চসজ্জারীতি ব্যবহৃত হচ্ছিল। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা এই ব্যাপারে এতটাই উৎসাহী ছিলেন যে ক্রোঞ্চমিথুন দৃশ্যের জন্য স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বক শিকারে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাখি না পেয়ে শিকারিদের কাছ থেকে দু'টি বক কিনে তাদের হত্যা করে দৃশ্যে ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য এই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে নি।

বিলাতি রীতি অনুসারী যবনিকা ও অঙ্কিত দৃশ্যপট এই নাটকে ব্যবহৃত হয়েছিল। ইন্দিরা দেবী ও অবনঠাকুরের স্মৃতিকথাধর্মী রচনাগুলি থেকে আমরা নাট্যচরিত্রগুলির রূপসজ্জা সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য পাচ্ছি। বাল্মীকির পোশাকে পিঠের দিকে লম্বা জোব্বা থাকত, যাতে বিলাতি রাজদের mantle -এর আভাস পাওয়া যেত। গলায় থাকত একটা রুদ্রাক্ষের মালা এবং একটি চেনে শঙ্খ ঝুলিয়ে দেওয়া হত। ডাকাতদের পোষাক বলতে ধুতি ও খালি গা, বুকে সরু শালুর ফেটি। লক্ষ্মী, সরস্বতী পৌরাণিক রীতি অনুসারে যথাক্রমে লাল ও সাদা পোষাকে সজ্জিত হয়েছিলেন।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি পুনরায় মহর্ষিভবনে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য আদি ব্রাহ্ম সমাজকে আর্থিক দিক থেকে সাহায্য করা। এর জন্য টিকিট করে অভিনয়ের আয়োজন হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গীতিনাট্যটিকে নতুন করে ঢেলে সাজান। পূর্বতন অভিনয়ের থেকে এই অভিনয়ের সময় মঞ্চভাবনা কিছুটা পরিবর্তিত হয়। হরিশচন্দ্র হালদারের উপর ছিল স্টেজ সাজাবার ভার। জীবন্ত বকের বদলে তুলোর বক দিয়ে হল ক্রৌঞ্চমিথুন। খড়ভরা মরাহরিণ দাঁড় করানো হয়েছিল মঞ্চে। হরিশচন্দ্র হালদারের মঞ্চসজ্জা সম্ভবত অনেকের পছন্দ হয় নি। কেননা, অবন ঠাকুর বলছেন — ''সিন আঁকলেন কচুবনে বন্যবরাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা যাচ্ছে। সেটা বরাহ কি ছাগল বোঝা যায় না।'[১]

এরপর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে আবার মহর্ষিভবনে 'বাল্মীকি প্রতিভা' র অভিনয় হয়, উপলক্ষ বড়লাট পত্নী লেডি ল্যান্সডাউনকে নিমন্ত্রণ। এই অভিনয় উপলক্ষেই 'বাল্মীকি প্রতিভা'র মঞ্চভাবনা সম্পূর্ণ বদলে ফেলা হয়। হরিশচন্দ্র হালদারের বদলে মঞ্চসজ্জার ভার অর্পিত হয় রবীন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্র নীতিন্দ্রনাথের উপরে। অবন ঠাকুরের 'ঘরোয়া' তে এই মঞ্চসজ্জার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে — ''মহা সমারোহে স্টেজ সাজানো হল। নিতুদা নিলেন স্টেজ সাজাবার ভার।..... মাটি দিয়ে উঠোনের খানিকটা অর্ধচন্দ্রকারে ভরাট করলেন। ..... বনজঙ্গল বানালেন সেই মাটিতে। স্টেজে সত্যিকার বৃষ্টি ছাড়া হবে, দোতলার বারান্দা থেকে টিনের নল সোজা চলে গেছে স্টেজের ভিতরে। নানারকম দড়িদড়া বেঁধে গাছপালা উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সিন বুঝে সেগুলি নামিয়ে দেওয়া হবে। পদ্মবন, শোলার পদ্মফুল, পদ্মপাতা বানিয়ে নেটের মতো পাতলা গজের পর্দা পর-পর চার-পাঁচটা স্তরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রথমটা বেশ ঝাপসা কুয়াশার মতো দেখাবে, পরে এক-একটা পর্দা উঠে যাবে, ও-পাশ থেকে আস্তে আস্তে ফুটবে আর একটু একটু করে পদ্মবনে সরস্বতী ক্রমশ প্রকাশ পাবে।..... তারপর বৃষ্টি হল স্টেজে ..... পিছনে আয়না দিয়ে নানারকম আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কড়কড় করে আমি ভিতর থেকে টিন বাজাচ্ছি, দুটো দাম্বেল ছিল, নিতুদা দোতলায় ছাদ থেকে সেই দাম্বেল দুটো গড়গড় করে এধার থেকে ওধার গড়াতে লাগলেন। ..... যতদূর রিয়ালিস্টিক করা যায় তার চূড়ান্ত হয়েছিল।''[২]

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী 'বাল্মীকি প্রতিভার'র মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন— ''এই অভিনয়ের কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলেত যান এবং ও দেশের রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখেন। মনে হয় সেখানকার মঞ্চে দেখা বাস্তব দৃশ্য মাথায় রেখেই রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা 'র মঞ্চ — পরিচালকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাছাড়া ইংরেজ লাটপত্নীর মনোরঞ্জনের তাগিদ তো ছিলোই''।[৩] এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য - ''আমাদের তো রিহার্সেল তৈরি, সময়ও হয়ে এসেছে। যত-সব সাহেবসুবো, লাটসাহেবের মেম আসবে। আমরা সাজব ডাকাত। মেজো জ্যাঠামশায় বললেন, ও হবে না, খালি গায়ে ডাকাত সাজা হবে না। কী করা যায়। আমি বললুম, তা হলে ঐ হাজারীদের মতো সাজ করা যাক। সবাই খুশি, বললেন, এ ঠিক হবে। ডাকো দরজী। ..... দরজী এসে আমাদের সাজ করতে লাগল, কাবুলীদের মতো গায়ে সেইরকম পাঞ্জাবি, পা অবধি কাবুলি পাজাম।''[৪] মঞ্চসজ্জায় যে রিয়ালিস্টিক আমেজ আনা হয়েছিল তার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন ইউরোপ প্রবাসকালে। ইউরোপীয় অপেরার প্রভাব 'বাল্মীকি প্রতিভা' র কোনো কোনো গানে রয়েছে যেমন — 'কালী কালী বলে রে আজ' গানটিতে রয়েছে Stephen Adam -এর Nancy Lee -'র সুরের আদল। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি'তে রয়েছে সেখানকার অপেরা দেখার অভিজ্ঞতার বিবরণ। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'বাল্মীকি প্রতিভা' র অভিনয় কালে মঞ্চসজ্জায় যে যে পরিবর্তন করা হয়েছিল তা পরবর্তীকালে মান্য করা হয়েছে। এরপর বহুবার 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনীত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল ১৩২৭ -এর ২৬ ভাদ্রের অভিনয়। ঐ দিন শান্তিনিকেতনে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গান্ধিজি ও তাঁর স্ত্রী।

'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ দশরথ-অন্ধমুনি উপাখ্যান অবলম্বন করে রচনা করেন 'কালমৃগয়া'। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর 'বিদ্বজন সমাগম' সভায় কালমৃগয়া অভিনীত হয়। পশ্চাদ্‌পট অঙ্কনরীতি এই নাটকেও ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকটির অভিনবত্ব হল এই প্রথম ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বনদেবী সেজে স্টেজে ঘুরে ঘুরে গান করেছিল। পরবর্তীকালে

এই বিষয়টি 'বাল্মীকি প্রতিভাতে'ও অঙ্গীভূত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারে মঞ্চে একটি জীবন্ত হরিণ প্রবেশ করানো হয়েছিল। 'কালমৃগয়া' অপেক্ষা 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় সাফল্য বেশি। তাই বারংবার 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনীত হয়েছে, তুলনায় 'কালমৃগয়া'র অভিনয় সংখ্যা কম। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর মতে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণে 'কালমৃগয়া'র গান অপরিবর্তিত বা সামান্য পরিবর্তনসহ গৃহীত হয়েছে। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে কালমৃগয়ার পুনঃ প্রচারে আগ্রহী হননি।

'বাল্মীকি প্রতিভা'কে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন 'সুরে নাটিকা' হিসাবে। আমরা 'গীতিনাট্য' রূপেও এটি কে চিহ্নিত করতে পারি। তবে পুরোদস্তুর নাটক এটি নয়। প্রথম সম্পূর্ণ নাটক 'রাজা ও রানী', ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে সোলাপুরে বসবাস কালে রচিত হয়। নাটকটি ঐ বছরই ৯ আগস্ট প্রকাশিত হয় এবং পুজোর ছুটিতে সত্যেন্দ্রনাথের বির্জিতলার বাড়িতে নাটকটি অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ — রাজা, সত্যেন্দ্রনাথ— দেবদত্ত, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী — সুমিত্রা, মৃণালিনী দেবী — নারায়ণী, প্রমথ চৌধুরী — কুমার সেন, নীতিন্দ্রনাথ — সেনাপতি। এই অভিনয় সম্পর্কে দর্শন চৌধুরী বলেন — ''সে যুগে এইভাবে বাড়ির মেয়েদের নিয়ে, বিশেষ করে দেওর-বৌদি, ভাসুর-ভাদ্রবৌ অভিনয় করাতে ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ে ১৮৭৩-এই অভিনেত্রীরা এসে গেছেন, কিন্তু ভদ্র ঘরের মেয়েরা এইভাবে প্রকাশ্যে অভিনয় করছে, এটা মেনে নিতে পারেনি অনেকে।''[৫] এই ধরনের ঘটনার সাক্ষ্য রবিজীবনী ও রবীন্দ্রজীবনীতেও পাওয়া যায়। বির্জিতলার বাড়িতে 'রাজা ও রানী' অভিনয়ের সময় দৃশ্যপটের সাহায্যে মঞ্চসজ্জা হয়েছিল। তার প্রত্যক্ষ ও অনুপুঙ্খ তেমন কোনো বিবরণ আমরা পাইনা বটে। তবে, পরোক্ষ একটা প্রমাণ অবন ঠাকুরের 'ঘরোয়া' তে রয়েছে — ''একদিন আবার আর এক কাণ্ড — অভিনয় হচ্ছে, হতে হতে ড্রপসিন পড়বি তো পড় একেবারে মেজোজ্যাঠাইমার মাথার উপরে প্রায়। রবিকাকা তাড়াতাড়ি মেজোজ্যাঠাইমাকে টেনে সরিয়ে আনেন।''[৬] একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবিরণ থেকে জানা যায় এমারেণ্ড থিয়েটারে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা গোপনে এই অভিনয় দেখে যায়। এবং পরবর্তীকালে তাদের 'রাজা ও রানী'র অভিনয়ে তার অনুকরণ করে। বিশেষত গুলফন হরি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর অনুকরণে সুমিত্রার চরিত্রে অভিনয় করেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে সাজাদপুরে অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'বিসর্জন' নাটক। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের অংশ বিশেষ নিয়ে রচিত হয় এই নাটক। প্রথম প্রকাশ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে। প্রথম সংস্করণটির সঙ্গে বর্তমান প্রচলিত সংস্করণের বহুল প্রভেদ। প্রথমের ২৯ টি দৃশ্য বর্তমানে ১৯টি দৃশ্যে পর্যবসিত হয়েছে। হাসি, তাতা, কেদারেশ্বর, অপর্ণার অন্ধ পিতা বাদ দেওয়া হয়। ধ্রুব ও চাঁদপাল চরিত্রের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়। শেষ অঙ্কও কিছুটা পরিবর্তিত হয়। 'বিসর্জন'-এর প্রথম অভিনয় সম্ভবত ঘরোয়াভাবে জোড়াসাঁকোতে হয় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে। ঐ বছরই বির্জিতলার বাড়িতে আবার এই নাটক অভিনীত হয় উপলক্ষ, ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যর আগমন। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ রঘুপতি এবং অরুণেন্দ্রনাথ পালন করেন জয়সিংহের ভূমিকা। অবনঠাকুর সেই স্মৃতি প্রসঙ্গে বলছেন — ''এই বাড়িতেই ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যকে 'বিসর্জন' নাটক দেখানো হয়, পুরানো সিন তৈরি ছিল সেই-সব খাটিয়েই।''[৭] রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চ ভাবনার ক্রমপরম্পরায় বিসর্জন'-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। রিয়ালিস্টিক মঞ্চভাবনার যুগে বিসর্জন অভিনীত হয়েছে রীতিমত সিন আঁকিয়ে, এমনকি সেই অভিনয়ে মাটির তৈরী কালী প্রতিমাও রাখা হত। অবন ঠাকুরের 'ঘরোয়া'র বিবরণ অনুসারে — ''স্টেজের একপাশে ছিল কালীমূর্তি বেশ বড়ো, মাটি দিয়ে গড়া। কথা ছিল রঘুপতি দূর দূর করে কালীর মূর্তিকে ধাক্কা দিতেই, কালীর গায়ে দড়াদড়ি বাঁধা ছিল, আমরা নেপথ্য থেকে টেনে মূর্তি সরিয়ে নেব।'' [৮] পরবর্তীকালে ১৯০২ -এর শীতকালে শান্তিনিকেতনে 'বিসর্জন' অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের সময়ও সিন আঁকা হয়েছিল, এঁকে ছিলেন হরিশচন্দ্র হালদার। রবীন্দ্রনাথ পরিচালকের ভূমিকায় থাকলেও, অভিনয়ে অংশ নেননি। সমালোচকেরা মনে করেন পরে নাট্য-প্রযোজনা সম্পর্কিত রবীন্দ্র ভাবনায় বিবর্তন এলেও , 'বাল্মীকি প্রতিভা' থেকে 'বিসর্জন' পর্যন্ত নাটকগুলিতে সুস্পষ্টরূপে পাশ্চাত্য প্রভাব বর্তমান। নাটকের গঠন -প্রকরণ যেমন শেকস্পিয়র অনুসৃত, তেমনি মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপট ইত্যাদিতে বিদেশি রঙ্গমঞ্চের প্রভাব বিদ্যমান।

১৮৯০- এর বিসর্জন অভিনয়ের পর খামখেয়ালি সভা এবং ড্রামাটিক ক্লাবের জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন দু'টি নাটক — 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২) ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭) । দু'টি নাটকই পরিচালনা ও অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেন। নাটক দু'টির মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে তেমন কোনো বিষদ তথ্য পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে শিশির কুমার ভাদুড়ির উদ্যোগে 'গোড়ায় গলদ' -কে ঈষৎ পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ নব রূপে নির্মাণ করেন 'শেষরক্ষা'। 'নাট্যমন্দির'- এ 'গোড়ায় গলদ' ও 'শেষ রক্ষা' দুটি নাটকই অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

১৮৯৭ -এ 'বৈকুণ্ঠের খাতা'-র পর দীর্ঘ এগার বছর আমরা রবীন্দ্রনাথকে নাটক রচনায় ব্যাপৃত হতে দেখি না। মাঝে ১৯০১ - এ বশীকরণ নামক একটি ক্ষুদ্র নাটক রচিত হয়। এই সময় পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবন পরিবর্তিত হয়েছে বহুলাংশে। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে তাঁকে। ব্যক্তিগত জীবনে একের পর এক নেমে এসেছে প্রিয়বিচ্ছেদজনিত শোকের আঘাত। দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পটভূমিতে ঘনিয়ে এসেছে দুর্যোগের ঘূর্ণাবর্ত। এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই আমরা আবার নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে পেলাম ১৯০৮- এ 'শারদোৎসব' -এর রচয়িতা হিসাবে। শান্তিনিকেতন পর্বে যখন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনার জন্য কলম তুলে নিলেন তখন সেই সব নাটকে বোলপুরের উদাত্ত প্রকৃতি পরোক্ষে যেন আপন লীলা বিস্তার করে চলল। প্রায় প্রতিটি নাটকেই প্রকৃতি স্বয়ং একটা চরিত্র হয়ে উঠল। এই পর্বে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য হল নাটকগুলিকে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-শিক্ষকের অভিনয় উপযোগী করে গড়ে তোলা। সেই জন্য অনেকগুলি বিষয়ের সমাধানসূত্র খুঁজতে হল নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে। অর্থের স্বল্পতা — ফলস্বরূপ মঞ্চসজ্জার এক আন্ত্যন্তিক সহজ-সরল রূপ। প্রাথমিকভাবে ছাত্রীহীন বিশ্বভারতী — যার জন্য নারীবর্জিত কাহিনি চয়ন বা ছাত্রদের দিয়েই নারী ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে নেওয়া। এই সমস্ত কিছুর সঙ্গেই মিলিত রয়েছে মঞ্চসজ্জার ঔপনিবেসিক প্রভাব মুক্তির এক আন্ত্যতিক প্রয়াস। আধুনিক বাংলা নাটক পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ অনুগামী এ বিষয় অস্বীকার করার নয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেও তো আমাদের দেশে যাত্রা কথকতার এক সু-প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। রয়েছে সেই পর্বের মঞ্চসজ্জার একটা নিজস্ব স্টাইল। শান্তিনিকেতন পর্বের এই পর্যায়ে মঞ্চসজ্জায় রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশি ঐ ধারাকে অনুসরণ করেছেন। আসলে এই সময় পর্বেরঅব্যবহিত আগেই দেশে ঘটে গেছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী গণ অভ্যুত্থান। সমগ্র দেশকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে স্বনির্ভর ভাবে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই পর্বের বিভিন্ন প্রবন্ধ অভিভাষণে। সেই বিষয়কেই শুধুমাত্র কথার কথা করে না রেখে তাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষে এগিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। একদিন বাল্মীকি-প্রতিভার যুগে সচেতনভাবে রিয়ালিস্টিক মঞ্চসজ্জার আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন আজ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করলেন সেই পথ। নির্মিত হল দেশীয় ঐতিহ্য সঞ্জাত মঞ্চসজ্জার এক নতুন রীতি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বঙ্গভঙ্গ সমসাময়িক পর্বে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'দেশীয় নাম' শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা। যেখানে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন তৎকালীন নাট্যমঞ্চগুলির বিদেশি নাম যথাস্টার, ক্লাসিক ইত্যাদির বিরুদ্ধে। এইগুলির পরিবর্তন ঘটিয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় আবহ নির্মানে কৃত্যসঙ্কল্প ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মঞ্চসজ্জারপরিবর্তনের যে প্রয়াস তার পিছনেও আসলে এই উদ্দেশ্যই নিহিত ছিল।

শান্তিনিকেতন পর্বের প্রথম নাটক 'শারদোৎসব'। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দেই এই নাটক রচিত ও প্রকাশিত হয় এবং অভিনীতও হয়। রবীন্দ্রনাথের সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত একটি চিঠি থেকে অভিনয়ের পূর্বে শান্তিনিকেতনের আবহ সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি — ''অন্যান্য বারে ছুটির অনেকদিন আগে থাক্‌তেই ছেলেদের মন বাড়ির মুখে চঞ্চল হয়ে ছুট্‌ত — এবারে একটা কল ফাঁদা গেছে। ছুটির ঠিক আগেই শারদোৎসব উপলক্ষে ছেলেদের নিয়ে একটা নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে — তাই সবাই খুব মেতে রয়েছে।'' 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা .....', 'অমল ধকল পালে লেগেছে', 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে', 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়' প্রভৃতি অসাধারণ গানের জন্য আজও এই নাটক দর্শক-পাঠক হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে। শান্তিনিকেতন নাট্যঘরে এই অভিনয় হয়। মঞ্চ একেবারে দৃশ্যপটহীন। মঞ্চের দু'ধারে দেবদারু পাতা বেঁধে ও লালরঙের পট্টবস্ত্র টাঙিয়ে যে মঞ্চসজ্জা হয় তা দর্শককে অভিভূত করে। বাংলার একান্ত নিজস্ব গ্রামীণ যাত্রার সাধাসিধে ভঙ্গি 'শারদোৎসব'-এর মঞ্চসজ্জায় মূর্ত হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চসজ্জা থেকে এই পর্বের মঞ্চসজ্জা এইভাবেই একটা স্বতন্ত্র পথে চালিত হয়। এই চিন্তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় প্রায় সমকালে রচিত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে। অঙ্কিত দৃশ্যপট বর্জন ও যাত্রার খোলামেলা মঞ্চের আন্তরিক আহ্বান সেখানে বারংবার লক্ষ করা যায়। ''যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সঙ্কীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সঙ্কীর্ণ হয় না।''

'শারদোৎসব' — এর অভিনয় সাফল্য রবীন্দ্রনাথকে নতুন নতুন নাটক রচনা ও অভিনয় পরিচালনার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করে। 'শারদোৎসব' -এর অব্যবহিত পরেই রচিত ও অভিনীত হয় 'মুকুট'। তারপর রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠক সমাজ উপহার পান 'প্রায়শ্চিত্ত', যদিও অভিনয় হয় বেশ কিছুদিন পরে। ১৯১০-এ 'রাজা' রচিত হয়। অভিনীত হয় ১৯মার্চ ১৯১১। তারপর রচিত হয় 'অচলায়তন' (১৯১২)। প্রথম অভিনীত হয় ১৯১৪-এর ৮ মে। এইপর্বে রচিত ও অভিনীত চারটি নাটকেই 'শারদোৎসব'-এর মঞ্চভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যাত্রার জন্য ব্যবহৃত সহজ সরল মঞ্চকে বিভিন্ন ভাবে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে ব্যবহার করেছেন।

'শারদোৎসব'-এর পর যে রবীন্দ্র নাটকের মঞ্চভাবনায় অনন্যতর দিকচিহ্নের অনুসন্ধান পাওয়া যায় তা হল – 'ফাল্গুনী'। নাটকটি রচিত হয় ১৯১৪-এর মার্চ মাসে সুরুলে বসবাস কালে। প্রাথমিকভাবে নাটকটির নাম ছিল 'বসন্তোৎসব', পরে পরিবর্তন করে হয় 'ফাল্গুনী'। প্রথম অভিনয় হয় — ২৭-এ এপ্রিল, ১৯১৫, শান্তিনিকেতনে। প্রশান্ত কুমার পাল এই নাটকের মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে বলেছেন — ''..... 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তিনি মঞ্চসজ্জার বাহুল্য বর্জন করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছিলেন। এরপরে শান্তিনিকেতনের অভিনয়ে অনেকটা বাস্তব কারণেই মঞ্চসজ্জা সরলীকৃত হয়ে আসে। 'ফাল্গুনী' অভিনয়ে সেই সরলতাকে অক্ষুন্ন রেখেই ইঙ্গিতময় করে তোলা হল।"[৯] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল — ''নাটকের অনেক সরঞ্জামের দাবি আমি পূরণ করতে পারি নি — কতকটা ইচ্ছা করলেও করিনি। দৃশ্যপট, concert, যবনিকা প্রভৃতি সব বাদ দিয়েছি। এই যে গাছের ডাল কেটে কৃত্রিম বন তৈরী হয়েছে — এটাও আমার ইচ্ছা ছিল না, এইসব সরঞ্জাম দর্শকদের অনেক সাহায্য করে সন্দেহ নেই — কিন্তু এই সাহায্য সম্প্রতি এমন বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে যে দর্শকদের কল্পনা নাকি প্রায় লোপ হবার দাখিল হয়েছে। নাট্যকারের লেখায় যদি প্রাণ থাকে তাহলে দর্শকবৃন্দের কোন বাধাই থাকা উচিত নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি কল্পনা করে নিতে — আশা করি এক্ষেত্রে আপনারা তাই করবেন — এটি আমার বিনীত নিবেদন।" [১০] বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যের জন্য ১৯১৬-র জানুয়ারীতে জোড়াসাঁকোতে 'ফাল্গুনী'র অভিনয় হয়। এই অভিনয়টির অন্যতম বিশেষত্ব হল শান্তিনিকেতন ও জোড়াসাঁকোর সম্মিলিত সহযোগিতায় এই প্রয়াস সংঘটিত হয়, যা পরবর্তী বহু নাটকে অনুসৃত হয়েছে।

'ফাল্গুনী'র মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতিধর্মী রচনা 'ঘরোয়া'তে আছে — ''ফাল্গুনী জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই হয়, ... বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের জন্য টাকা তুলতে হবে, যত কম খরচ হয় তারই চেষ্টা। ব্যাকগ্রাউণ্ডে দেওয়া হল সেই বাল্মীকি প্রতিভার নীল রঙের মখমলের বনাত, দেখতে হল যেন গাঢ় নীল রঙের রাতের আকাশ পিছনে দেখা যাচ্ছে। ..... বাদামগাছের ডালপালা এনে কিছু কিছু এখানে-ওখানে দিয়ে স্টেজ সাজানো হল। ..... বাঁশের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে দোলা টানিয়ে দিলুম। উপরে একটু ডালপাতা দেখা যাচ্ছে, মনে হতে লাগল যেন উঁচু গাছের ডালের সঙ্গে দোলা টানানো হয়েছে।"[১১] 'ফাল্গুনী'র ভূমিকা 'বৈরাগ্যসাধন'-এ অজন্তার অনুকরণে মঞ্চের উপরে একটি সম্পূর্ণ রাজসভা তৈরী করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে এই মঞ্চসজ্জাকে নিতান্ত নিরাভরণ বলা চলে না। দর্শক মনোরঞ্জনের কথা চিন্তা করেই এ-হেন মঞ্চসজ্জা। দু'দিন অভিনয়ে টিকিট বিক্রি করে মোট আয় ৮১৭১ টাকা। এই টাকা পুরোপুরি দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দেওয়া হয়। নাটক অভিনয় বাবদ যে খরচ হয় তার ব্যয় পুরোপুরি বহন করেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখ।

ডাকঘর রচিত হয় ১৯১১। প্রথম অভিনয় 'The Post office' অনুবাদের ১৯১৩-তে। ইয়েটস্-এর উদ্যোগে ডাবলিনে ১৭ মে ১৯১৩, এবং লন্ডনে ১০ জুলাই, ১৯১৩-তে। প্রথম অভিনয় হয় মেরি কার্পেন্টার হলে। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। পরবর্তীকালে ১৯১৭-তে প্রথমে শান্তিনিকেতন ও পরে ঐ বছরই কোলকাতায় জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে নাটকটি অভিনীত হয় পরপর কয়েকদিন। 'ডাকঘর' নাটক রচনার এতদিন পর অভিনয়ের উদ্যোগ নেওয়ার কারণ প্রাথমিকভাবে অমল চরিত্রের উপযোগী অভিনেতা না পাওয়া। আশামুকুল নামক এক কিশোরকে পাওয়া যায় অমলের চরিত্রাভিনেতা রূপে। তার অভিনয় আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। এই নাটকের অন্যান্য অভিনেতা ছিলেন — রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুরূপা, অসিত হালদার প্রমুখ।

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু ছিলেন মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে। অবনীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে জানা যায় সেই মঞ্চসজ্জার বিবরণ — ''ডাকঘর অভিনয় হবে, স্টেজে দরমার বেড়ার উপর নন্দলাল খুব করে আলপনা আঁকলে। একখানা খড়ের চালাঘর বানানো হল। তক্তায় লাল রঙ, ঘরে কুলুঙ্গি, চৌকাঠের মাথায় লতাপাতা, ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার যেন একটি পাড়াগেঁয়ে ঘর। সব তো হল। ..... আমি একটা পিতলের পাখির দাঁড়ও এক পাশে ঝুলিয়ে দেওয়ালুম।

নন্দলাল বললে, পাখি?

আমি বললুম, না, পাখি উড়ে গেছে, শুধু দাঁড়টি থাক্।

দেখি দাঁড়টি গল্পের আইডিয়ার সঙ্গে মিলে গেল। সবশেষে বললুম, এবারে এক কাজ করো তো নন্দলাল। যাও, দোকান থেকে একটি খুব রঙচঙে পট নিয়ে এসো তো দেখি। নন্দলাল পট নিয়ে এল। বললুম, এটি উইঙের গায়ে আঠা দিয়ে পট্টি মেরে দাও।

যেমন ওটা দেওয়া, একেবারে ঘরের রূপ খুলে গেল।"[১২]

'ডাকঘর' -এর অভিনয় ও মঞ্চসজ্জা উভয়ই দর্শক সাধারণের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সঞ্চারিত করে। 'ডাকঘর'- এ তত্ত্ব নিরপেক্ষ এক মানবিক আবেদন আছে, যা সর্বযুগে দর্শককে আলোড়িত করে। 'শারদোৎসব' পরবর্তী বস্তুহীন মঞ্চভাবনার সঙ্গে এই মঞ্চ ভাবনা ঠিক মেলে না। তবে সুরুচিসম্মত শিল্পকলা ও ইঙ্গিতময়তার এমন যথার্থ সমন্বয় খুব কমই দেখা যায়। সব মিলিয়ে বলা যায় যে 'ডাকঘর'-এর মঞ্চসজ্জা এক অনবদ্য সৃষ্টি।

'অচলায়তন' ভেঙে রচিত হয় 'গুরু' (১৯১৮) এবং 'রাজা' ভেঙে রচিত হয় 'অরূপরতন' (১৯২০) শারদোৎসব ভেঙে এই পর্বের অপর উল্লেখযোগ্য নাটক 'ঋণশোধ' (১৯২১)। এই তিনটি নাটকের মধ্যে 'অরূপরতন' ও 'ঋণশোধ'-এর অভিনয় বিভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্য। 'অরূপরতন'-এ রানির ভূমিকায় অভিনয় করতেন রাণু অধিকারী। এই অভিনয়ের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্র নাট্যে নৃত্যের প্রবেশের পথ প্রশস্ত হয়। 'ঋণশোধ'-এর অভিনয় উপলক্ষে সমালোচনার তীব্র ঝড় ওঠে। 'ঋণশোধ'-এর অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় আলফ্রেড ও ম্যাডান থিয়েটারে। ঠাকুর পরিবারে নারী-পুরুষ মিলিত ভাবে মঞ্চাভিনয় প্রচলিত ছিল অনেক আগে থেকেই। কিন্তু এই অভিনয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা সম্মিলিত ভাবে অভিনয় করে তাও পাবলিক থিয়েটারে। এই বিষয়টি নিয়ে সমসাময়িক সময়ে প্রবল আলোড়ন হয়। তবে মঞ্চভাবনা যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর ছিলেন মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে তবে অবনঠাকুরও প্রয়োজনে ছাত্রদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজের থেকে জানা যায় মঞ্চসজ্জার কিছু তথ্য —' "..... but a ward must be said about the decoration of the stage which contributed not a little of its success. A screen of light blue with silver white borders symbolising the autumn -sky formed the simply but suggestive backkground of the stage."[১৩]

বিসর্জন বহুবার অভিনীত হলেও ১৯২৩-এ ২৫,২৭,ও ২৮ আগস্ট কলকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারের অভিনয় একটা স্বতন্ত্র দিকচিহ্নবাহী। ৬২ বছরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয়ে তরুণ জয়সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই অভিনয় তৎকালীন বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব অমৃতলাল বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ি প্রমুখকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। মঞ্চভাবনায় দেখা দিয়েছিল সম্পূর্ণ নতুনত্ব। শান্তিনিকেতন যুগ থেকে রিয়ালিস্টিক মঞ্চভাবনা বর্জন করে প্রতীকায়িত যে মঞ্চভাবনার সূচনা ঘটেছিল, এই অভিনয়ের সময় দেখা গেল তার পূর্ণায়ত প্রকাশ। রিয়ালিস্টিক সিন আঁকা পুরোপুরি বর্জন করা হল। সমতল মঞ্চকে কয়েকটি ধাপে বিভাজিত করে আলাদা ব্যঞ্জনা সৃষ্ট হল। প্রতীকের সুনিপুণ ব্যবহার মঞ্চভাবনার একটা নতুন দিক উন্মোচন করল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মন্দিরের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হল পুষ্পপাত্র ও দীপবৃক্ষ। সর্বোপরি পোষাক পরিচ্ছদেও এল নতুন ভাবনা। নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর ছিলেন এই মঞ্চভাবনার নেপথ্যের প্রধান কারিগর। যদিও, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রত্যেক্ষ সহযোগিতায়।

পূর্ববর্তী নাটক ভেঙে নতুন নাটক রচনার যে প্রেরণা 'গুরু' - 'অরূপরতন' - 'ঋণশোধ' -এর যুগে দেখা দিয়েছিল তা আবার ফিরে এল 'তপতী'র মাধ্যমে ১৯২৯-এ। 'রাজা ও রানী' ভেঙে 'তপতী'র সৃজন। ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বরে কোলকাতায় এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে এই নাটক অভিনীত হয়। আটষট্টি বছরের রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হন রাজা বিক্রমের ভূমিকায় এবং অমিতা ঠাকুর সুমিত্রার ভূমিকায়। অভিনয়ের মহড়া চলাকালীন খবর আসে লাহোর কারাগারে যতীন দাস অনাহরে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তি ধরা পরে 'সর্বখর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানের মধ্যে। গানটি তপতী নাটকে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই নাটকের মঞ্চভাবনার প্রধান বিশেষত্ব হল দৃশ্যপট বিহীনতা। আলোক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে দৃশ্য পরিবর্তন বিষয়টি পরিস্ফুট করে তোলা হয় আলোর যথার্থ ক্রিয়াশীলতা দর্শক মনে সঞ্চারিত করার জন্য পশ্চাদপট পুরো সাদা রাখা হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'য় বারংবার সপ্রশংস 'তপতী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। পোশাক পরিচ্ছদেও ছিল যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয়। আবদুল খালিফের দোকান থেকে এসেছিল মখমলের কাপড়, জরির সুতো প্রভৃতি। হারাসীন নামক এক জাপানি মহিলা ও প্রতিমা দেবী ছিলেন পোষাক তৈরীর দায়িত্বে। নন্দলাল বসু ও সুরেন কর নিয়েছিলেন মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব।

'অরূপরতন'-এ নৃত্যাঙ্গিকের যে সামান্য স্ফুরণ ঘটেছিল, পরবর্তীকালে তা আরও প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে 'নটীর পূজা' উপলক্ষে। 'নটীর পূজা' রচিত হয় ১৯২৬-এ। 'কথা ও কাহিনী'র পূজারিনী কবিতাটির থেকে আখ্যানভাগ চয়ন করে নির্মিত হয় 'নটীর পূজা'। মণিপুরী নৃত্যাঙ্গিকের উপর 'নটীর পূজা'র নৃত্যভাবনা প্রতিষ্ঠিত। এই নাটকে নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী নটীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন — ''গৌরীর নৃত্য দেখবার পর কবির সন্দেহ থাকিল না যে, নৃত্যকলায় শান্তিনিকেতনের দিবার মতো কিছু আছে।'' এই ভাবনা আরো বিকশিত হয়ে উঠল পরবর্তী ঋতুপরিক্রমাধর্মী নাটকগুলি সর্বোপরি রবীন্দ্রজীবনের শেষপর্বের নৃত্যনাট্যগুলিতে — 'শাপমোচন' (১৯৩১), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬) 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৮), 'শ্যামা' (১৯৩৯)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য,

'শ্যামা'ই রবীন্দ্রনাথের লেখা শেষ নাটক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বছরে যা প্রকাশিত হয়। এরপরে তিনি আর কোনো নাটক রচনা করেননি। নৃত্যনাট্যগুলিতে নাট্যপোযোগী আখ্যান নির্মাণ, কাহিনির উপযোগী নতুন গান রচনা, সুর সংযোজন, পুরানো গানের নব রূপায়ন, নৃত্যকলার অভিনব সংযোজন প্রভৃতি বিষয়ে অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেলেন তা তুলনা রহিত। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর মতে ''অভিনয়ের নানা অভিজ্ঞতার পর একদিন রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকেই তাঁর নাট্যভাব প্রকাশের উপযুক্ত বাহন বলে মনে করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই সময় থেকেই তিনি বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ-সংগ্রহ এবং আদর্শ প্রচার তথা বিশ্বভারতীর বিশিষ্ট শিক্ষার নান্দনিক পরিচয় তুলে ধরার জন্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর শুরু করেন। এই সফর কালে তাঁর সঙ্গে থাকত নাটকের দল। দীর্ঘ সফরের অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অভিনয় পত্রীতে ইংরেজি ভাষায় নাট্যবস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও অবাঙালি দর্শক-শ্রোতার পূর্ণ রসগ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে কেবল ভাষাগত ব্যবধানের জন্য। কিন্তু নৃত্যের মাধ্যমে দেহভঙ্গির ভাষা হল সর্বজনীন।"[১৪] এই পর্যায়ের নাটকগুলিতে দৃশ্যপট পুরোপুরি বর্জিত হল। কোথাও বা উঁচু রঙ্গমঞ্চও বর্জিত হয়েছে। দৃশ্যপটের বদলে এসেছে সাদা বা নীল পশ্চাৎপট, আবার কোথাও বা নাট্যভাব প্রকাশের উপযোগী সাংকেতিক চিত্র। প্রতিটি নৃত্যনাট্য অভিনয়ের সময়ই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন। কখনো চরিত্র হিসাবে (উপালি, নটীরপূজা), আবার কখনো নৃত্যনাট্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যাংশ আবৃত্তি উপলক্ষে। আসলে এর পিছনে কবির একটা সাবধানী মনোভাব কাজ করত। তখনো পর্যন্ত বৃহত্তর দর্শক সমাজে ভদ্রপরিবার সংশ্লিষ্ট মেয়েদের প্রকাশ্য মঞ্চে নাচ-গান উদাত্তচিত্তে গৃহীত হয় নি, মঞ্চে নৃত্য-গীতরতা মেয়েদের সম্পর্কে সাধারণ দর্শকের মধ্যে যাতে বিরূপ ধারণা না হয়, তাই তিনি স্বয়ং তাদের সাথে মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন।

সমগ্র রবীন্দ্র নাটকের মঞ্চসজ্জায় রয়েছে এক ক্রমবিবর্তিতরৈখিক অভিঘাত। নাটক রচনার প্রাথমিক পর্বে রবীন্দ্র চেতনায় মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে ছিল রিয়ালিস্টিক ভাবনার উৎসার। সদ্য বিলেত ফেরত রবীন্দ্রনাথের মনন কোনে তখন প্রবাসে দেখা নাট্যস্মৃতি ভীষণভাবে জাগ্রত। ফলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ মঞ্চে এল দৃশ্যপটের বহুল প্রয়োগ। শুধু দৃশ্যপট নয়, রিয়ালিস্টিক সামগ্রীর ব্যবহারে মঞ্চকে বাস্তবসম্মত রূপে গড়ে তোলার প্রেরণাও কার্যকরী ছিল এই পর্বে। একসময় এই চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটল। দেশীয় ঐতিহ্য নবরূপে ধরা দিল কবি মানসে। চিত্রপট নয়, চিত্তপটের জয়গান গাইলেন তিনি। সঙ্গে এল প্রতীকায়িত মঞ্চ-ভাবনার নতুন চেতনা। আলোর ব্যবহারও শুরু হল বিবিধ ব্যঞ্জনার বার্তাবাহী রূপে। রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চভাবনা রবীন্দ্রসংস্কৃতিরই একটা দিক। এই চেতনা রবীন্দ্রমানস সঞ্জাত। তবে তাকে বাস্তবের ভূমিতে যথাযথ রূপে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গগনেন্দ্রনাথ —অবনীন্দ্রনাথ— নন্দলাল বসু- সুরেন্দ্রনাথ কর-দের অবদান বিস্মৃত হবার নয়। এই মঞ্চভাবনার দ্বারা সমসাময়িক সময় এবং পরবর্তী সময়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চ উপকৃত হয়েছে বহুল ভাবে। গতানুগতিকতা ছেড়ে নতুন পথে পা বাড়াবার সাহস নাট্যকর্মীদের যুগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথই। উন্মুক্ত হয়েছিল তাঁদের চেতনার দ্বার। সেখানে দেখা দিয়েছিল মঞ্চসজ্জা সংক্রান্ত নিত্য-নতুন চিন্তার ফসল। তবে সবকিছুর মূলে রয়েছে সেই 'খেলা ভাঙার খেলা'-র কবির প্রেরণা।

তথ্যসূত্র ঃ

১) ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, চন্দ রাণী; ঘরোয়া; বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ; পৃষ্ঠা - ৯৯।
২) ঐ , পৃষ্ঠা - ১১৮।
৩) চক্রবর্তী রুদ্রপ্রসাদ, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা - ৩১।
৪) ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, চন্দ রাণী; ঘরোয়া, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ; পৃষ্ঠা -১১৭।
৫) চৌধুরী দর্শন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি; পৃষ্ঠা - ৩০৭।
৬) ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, চন্দ রাণী; ঘরোয়া; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ; পৃষ্ঠা - ১০৬।
৭) ঐ , পৃষ্ঠা - ১০৯।
৮) ঐ , পৃষ্ঠা - ১১০।
৯) পাল প্রশান্ত কুমার, রবিজীবনী (সপ্তম খন্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা - ৯৫।
১০) ঐ , পৃষ্ঠা - ৯৬।
১১) ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, চন্দ রাণী; ঘরোয়া; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা - ১৩২।
১২) ঐ , পৃষ্ঠা - ১৩৬।
১৩) পাল প্রশান্ত কুমার, রবিজীবনী (অষ্টম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা - ২৩০।
১৪) চক্রবর্তী রুদ্রপ্রসাদ, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা - ২৪৫।